তারিখ ... 19 JUL 2017 ... পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩

শিক্ষা ও সামাজিক সম্পৃক্ততা : আমরা কোথায়?

উচ্চশিক্ষা

ড. মো. ইকবাল হোছাইন
অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন ৩৯, আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ৯০-এর অধিক। হাজার হাজার শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কয়েক লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। আমার জানামতে, 'কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচিং ফর কমিউনিটি এনগেজমেন্ট' নামে সেন্টার বা বিভাগ নেই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রের ফান্ডে পরিচালিত হওয়ায় সমাজ ও জাতির মৌলিক প্রয়োজন বিষয়ক কিছু সাবজেক্ট থাকলেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এসবের বালাই নেই। উভয় শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আমরা পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে প্রতি বছর চাকরিপ্রার্থী বের করে দিচ্ছি। তারা সমাজের কতটুকু কল্যাণে আসছে তা ভাবার সময় এসেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এ চাকরিমুখী প্রবণতা চাকরি নামক সোনার হরিণের পেছনে ছুটতেই উৎসাহিত করে

মানুষ সমাজ সংযুক্ত সত্তা। মানুষ কেন; গবেষণায় দেখা গেছে কোনো প্রাণী সমাজবিহীন বাস করে না। তবে মানুষের সঙ্গে পার্থক্য হলো এরা অনেকটা শৃঙ্খলা ও বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ, যা অন্য অনেকের মাঝেই পাওয়া যায় না। এ জন্যই মানুষ শ্রেষ্ঠ। মানুষ সভ্যতার ধারাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, যেখানে বিবেক বা দায়িত্ববোধ রাজনৈতিক মানচিত্রে আর সীমাবদ্ধ নয়। সিরিয়ায় অবৈধ যুদ্ধ, মিয়ানমারে মুসলিম নির্যাতন এমনকি আমাদের দেশেও ধর্ম বা অন্য কোনোভাবে নির্যাতন হলে তা আর দেশীয় বিষয় থাকে না। আন্তর্জাতিকভাবে এর প্রতিক্রিয়া হয় বা হচ্ছে। ঠিক শিক্ষার ব্যাপারেও এ কনসেপ্ট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংযুক্ত হচ্ছে। বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন কেবল পরিচিত ছিল জ্ঞান আহরণ, উদ্ভাবন ও বিতরণের ক্ষেত্র হিসেবে। একবিংশ শতকের এ সময়ে এসে গবেষকদের মধ্যে চিন্তার পরিবর্তন এসেছে। তারা বলছেন, কেবল জ্ঞানের উদ্ভাবন করলেই হবে না; যারা সমাজের মূল শক্তি তথা দেশ, জাতি ও বিশ্বের 'অর্থনীতির চালিকাশক্তি, তাদের কাছে শিক্ষার ফল নিয়ে যেতে হবে। সমাজের প্রত্যেক মানুষের কাছে শিক্ষার ফল তথা সেবার হাত বাড়াতে হবে। আর তা শুরু হবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সমাজের কোনো অস্থিরতা বা সংকট দেখা দিলে ব্রিটেনের জনগণ চেয়ে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিকে। তাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস, শিক্ষকরা রাজনীতিবিদদের সংকট সমাধানে সঠিক নির্দেশনা দেবেন। আর আমাদের দেশে এসব সংযুক্ত সংকট নিরসনে শিক্ষকদের কোনো ভূমিকা আছে? জাতির প্রতি নিজস্ব দায়বদ্ধতার পরিমাপ কি তারা করেন? করেন না বলেই জাতিও তাদের প্রতি তাকায় না। চেয়ে থাকে রাজনীতিবিদদের দিকে। আর আমরা শিক্ষকরাও রাজনীতিবিদদের আশীর্বাদ লাভের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে দলীয় লেজুড়বৃত্তির রাজনীতিকে পেশায় পরিণত করেছি। রাজনীতিবিদদের আশীর্বাদ ছাড়া তো পদ-পদবি পাওয়া যাবে না। এ বৈপরীত্য কিন্তু শুধু উন্নত বিশ্বে নয়, আমাদের উপমহাদেশের অনেকেই কাটিয়ে উঠেছে।

আজ এসব নিয়ে কথা বলব না। বলছিলাম কমিউনিটি এনগেজমেন্টের কথা। বেডারবিট ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর টিচিংয়ের সহকারী পরিচালক 'জ বন্ডি' বলেন, যাদের থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার সব জোগান আসে, যারা আমাদের প্রেরণার মূল কারিগর তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবিত জ্ঞানের সুফল সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার একটি দায়িত্ব আমাদের অবশ্যই আছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভলান্টিয়ার ও বিভিন্ন সেন্টারের শিক্ষক-ছাত্রদের দ্বারা আমরা আশপাশের মানুষের সঙ্গে এ চমৎকার সেতুবন্ধ গড়ে তুলেছি। আমি ব্রিটেনে পড়ার সময় দেখেছি, সমাজের প্রয়োজনের সব বিষয়ে সচেতনমূলক কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংযুক্ত করা হতো। এমনকি ছোট ছোট কোর্সের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাজের ট্রেনিং দেওয়া হয়। বুচার কীভাবে তার মাংস কাটবে, গৃহপরিচারিকা কাজগুলো কীভাবে গোছাবে এবং তাদের নিয়োগকর্তার সঙ্গে আচরণ কী হবে, এসব ছোট অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ই করে থাকে।

এবার যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে দেখেছি, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কর্মকাণ্ড সমাজের প্রয়োজনীয় সব বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে ফেলেছে। ক্যালিফোর্নিয়া ভার্সিটির 'এক্স সেন্টার'-এর পরিচালক ক্যালিফোর্নিয়ার সামাজিক সমস্যা, প্রাইমারি শিক্ষকদের কোর্স, কোয়ালিফায়েড হেডমাস্টার্স কোর্স থেকে শুরু করে এহেন কোর্স নেই, যা চালু করেনি। তাদের সেন্টারের একটি বড় সাইনবোর্ড দেখলাম– 'টিচিং ফর চেঞ্জ লস অ্যাঞ্জেলেস'। লস অ্যাঞ্জেলেস পরিবর্তনের শিক্ষকতার মাধ্যমে তারা সব সমস্যার কারণ নির্ধারণ এবং এর যৌক্তিক সমাধানের প্রচেষ্টা যৌথভাবে গ্রহণ করে। পরিচালককে আমার প্রশ্ন ছিল– এ সেন্টারের বিশাল কার্যক্রমের লোকবল কোথায় পান, আর ফান্ড আসে কোত্থেকে? মুচকি হেসে তিনি বললেন, আপনার এ প্রশ্নটি সব ভিজিটরই করেন। প্রথমত আমরা মনে করি, কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অর্থের প্রয়োজন। তবে এটাই একমাত্র উপাদান নয়। আপনার যদি দৃঢ় সিদ্ধান্ত থাকে তা বাস্তবায়নের, তাহলে অর্থ কোনো না কোনোভাবে জোগাড় হয়ে যাবে। প্রথমত– ১. যারা ট্রেনিং করতে আসে তাদের থেকে একটি টোকেন অর্থ নিই; ২. আমাদের কার্যক্রমের ওপর পর্যবেক্ষণ করে বিশ্ববিদ্যালয় একটি ফান্ড দেয়; ৩. আমরা বিভিন্ন এনজিও ও চ্যারিটেবল প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রজেক্টের বিপরীতে ফান্ড চাই; ৪. সমাজহিতৈষী, দানশীল ব্যক্তিদের কাছে আমরা বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে সাহায্য চাই। আনন্দের বিষয় হলো, অনেকে এসে আমাদের অর্থ দিয়ে যান। অর্থ আমাদের কখনও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন হাজারো ভলান্টিয়ার আছে, যারা বিদেশি পর্যটকদের কোনো সম্মানী ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও এলজির অনেক স্থানে গাইডের দায়িত্ব পালন করে। আমাদেরও চায়নিজ বংশোদ্ভূত সোসিওলজি বিভাগের এক ছাত্রী ক্যাম্পাসের কিছু অংশ ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। পর্যটকদের ক্যাম্পাস দেখানোর জন্যও এখানে লিস্টভুক্ত অনেক ভলান্টিয়ার আছে, শুনে ভালো লাগল। এমনিভাবে ক্লিবল্যান্ড ইউনিভার্সিটি, কুইন্স ইউনিভার্সিটিতেও আমি কমিউনিটি এনগেজমেন্ট কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেছি, যেটা এক যুগ আগেও তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন ৩৯, আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ৯০-এর অধিক। হাজার হাজার শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কয়েক লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। আমার জানামতে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচিং ফর কমিউনিটি এনগেজমেন্ট নামে সেন্টার বা বিভাগ নেই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রের ফান্ডে পরিচালিত হওয়ায় সমাজ ও জাতির মৌলিক প্রয়োজন বিষয়ক কিছু সাবজেক্ট থাকলেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এসবের বালাই নেই। উভয় শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আমরা পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে প্রতি বছর চাকরিপ্রার্থী বের করে দিচ্ছি। তারা সমাজের কতটুকু কল্যাণে আসছে তা ভাবার সময় এসেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এ চাকরিমুখী প্রবণতা চাকরি নামক সোনার হরিণের পেছনে ছুটতেই উৎসাহিত করে। আরাধ্য চাকরি পেলেই পাবলিক নামক প্রজাতির ওপর কীভাবে স্টিম রোলার চালানো যায় তার ফন্দিফিকিরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। বিশ্ববিদ্যালয় আঙিনায় থাকাকালে যদি তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের গ্রাম ও সমাজের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রচেষ্টা থাকত, সমাজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ভালো ধারণা দেওয়া হতো তাহলে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে কেবল টাকার জন্য কর্ম নয়, বরং সেবার জন্য কর্মই মুখ্য হয়ে উঠত। সেবার বিপরীতে রাষ্ট্র তো সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী সবাইকে বেতন দিচ্ছে।

আমি প্রায় দু'দশক ধরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় নিয়োজিত। শিক্ষকতার প্রথমদিকে সমাজের লোকদের সঙ্গে কথা বলে কিছু তথ্য আনতে পাঠালে তারা প্রশ্ন করত, এটা কি এনজিওর কাজ? উত্তর দিলে বলত, টাকা পাওয়া যাবে? এসব কারণে আর শিক্ষার্থীদের পাঠাতে পারিনি। দুই দশকে সমাজের স্থানীয়দের সঙ্গে বলতে গেলে কোনো সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি। বলা যায়, ছাত্রছাত্রীদেরও তেমন সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আর এলাকার লোকজন বিশ্ববিদ্যালয়কে মেধার লালন বা শিক্ষার স্থান হিসেবে জানার চেয়ে চাকরি পাওয়ার লোভনীয় কেন্দ্র হিসেবেই জানে বেশি। আমার মনে হয়, ঢাকার বাইরের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা প্রায় একই। এসব সমস্যা ও মিথের একটি যৌক্তিক সমাধান হতে পারে 'টিচিং ফর কমিউনিটি এনগেজমেন্ট' তথা সমাজ সংযুক্তির শিক্ষার মাধ্যমে। জানি, আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন দুরূহ। তারপরও তো আমাদের হাঁটতে হবে, সামনের দিকে এগোতে হবে। ইতিমধ্যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ সব শিক্ষক-শিক্ষার্থী এরূপ চিন্তায় এগিয়ে এলে সফলতা আসবেই।